পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা

অনুরাধা দে

একটি সাংবাদিক প্রতিবেদন

স্বপ্ন ও বাস্তবের পরিসর ঃ ভাষার আত্ম - পর

মানুষ কি নিজের ভাষা ছাড়া ভিন্ন ভাষায় স্বপ্ন দেখে? 'অন্য' ভাষায় 'দক্ষতা' অর্জনের স্বপ্নও কি আমরা সেই ভাষাতেই দেখি? মনে হতে পারে প্রশ্নটা অদ্ভুত। কারো কারো কাছে হয়তো বা অবান্তরও হটে। প্রশ্ন হতে পারে 'নিজের ভাষা' বলতে কী বোঝায়? 'অন্য' কি কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আছে? সমাজভাষাবিদেরা প্রশ্ন তুলবেন, যদি একটি শিশুর বাস হয় কোনো হিন্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে, তার বাবা তামিল ভাষি ও মা বাংলা ভাষি বাবা - মায়ের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা কখনও হিন্দি, কখনও ইংরেজি, সঙ্গে তামিল - বাংলার টুকরো বুলি, পারিপার্শ্বিকের ভাষা হিন্দি-ইংরেজির মিশেল এবং হয়ত বা মারাঠি বা পাঞ্জাবি প্রতিবেশি/ প্রতিবেশিনীর ভাষিক অবদানে আরও বর্ণময়, সে শিশুর মনোজগতের বিন্যাস কেমন হবে? কী করে চিনবে কোন্ ভাষাটা তার আপন, কোনটাই বা 'অপর'? আরও প্রশ্ন উঠতে পারে, চেনার সত্যিই কি প্রয়োজন আছে কিছু? — বিশেষত বহুভাষাজনিত জটিলতাকে সহজে সামলানোর সহজাত ক্ষমতা নিয়েই যখন জন্মায় একটি শিশু! সমাজ ও মনের মেলবন্ধনে সে তো প্রতিটি ভাষার আকর আহরণ করবে। দক্ষতার হেরফের, প্রয়োজনের তাগিদ নিজে থেকেই সীমায়িত করবে নিজের ভাষিক ব্যবহারের ক্ষেত্রকে। বহুভাষী মানুষের কাছে তার ভাষাজগতেরপ্রতিটি ভাষাই কি তার আপন ভাষা নয়? বহুভাষাভাষী মানুষের দেশে প্রশ্নগুলির যথার্থতা নিয়ে সমাজ - ভাষাতত্ত্বের উৎসাহী পাঠকমাত্রেই নিঃসন্দেহ। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে মূল প্রশ্নটাই যথেষ্ট জটিল হয়ে যায়। কোনো রাষ্ট্রে ভাষিক কেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসৃত হলে বহুভাষী মানুষ নিজেকে এমন একটি ভাষাবলয়ের মধ্যে আবিষ্কার করে যেখানে কিছু ভাষা অস্তিত্বের অঙ্গ হয়েও তার চেতনার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। এই বৈপরীত্যের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে তার প্রতিমুহূর্তের বাচনিক নির্মাণ। তার নিজস্ব ভাষিক চেতনাই নির্ধারণ করে ভাষার আপন-পর এ কোনো বাইরে থেকে লাগানো তকমা নয়। তবে ভাষিক চেতনাও অন্তসর্বস্ব নয়। মনোজগতের পরিকাঠামোনির্মণে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিবার, পরিস্থিতি, সময়, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতির প্রভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একটি ভাষার অন্দরে- কন্দরে বক্তার বিচরণ স্বচ্ছন্দ ওসাবলীল কিনা, সেই ভাষার শিক্ষার এবং ব্যবহারে কোনোরকম অস্বস্তি বা উদ্‌বেগ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা এবং সবই নির্ভর করে ভাষার সঙ্গে বক্তার আর্থ - সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং তার ভাষাগত মনোভাবের ওপর। 'অপর' ভাষায় তার স্বপ্ন নির্মিত হতে পারে কিনা তাও চেতনা নির্মাণেরই অঙ্গ। এই পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে অনুচ্ছেদের প্রথমে তোলা প্রশ্নটা হয়ত ততটা অবান্তর নয়।

(১৯৪৭) কোলকাতা ঝিবিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়েছেন। পাঁচ বছর ধরে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইনস্টিটিউটে। এখনও গবেষণা করেন। বিষয় ইংরেজি ভাষা শিক্ষার টানাপোড়েন।

প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে রেখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম - শহর - মফস্‌সলের বাংলা - মাধ্যম স্কুলের নবম - দশম শ্রেণির প্রায় আড়াইশ স্কুলপড়ুয়ার কাছে। এদের ভাষিক চালচিত্রের ফুল-পাতার বিন্যাস স্পষ্ট। সকলেরই প্রথম ভাষা বাংলা। স্কুলে দ্বিতীয় ভাষাহিসেবে ইংরেজির পাঠ নিয়েছে পাঁচ - ছয় বছর। তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত বা আরবির পাঠ নিয়েছে বছর দুই। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা মাধ্যমে হিন্দির পাঠ নেয়নি। কিন্তু হিন্দিভাষী প্রতিবেশী এবং প্রচারমাধ্যমের সংস্পর্শে তাদের ভাষাবলয়ে হিন্দির অল্পবিস্তর উপস্থিতিলক্ষ করা যায়। অন্যান্য ভাষার সাহচর্য কিছুক্ষেত্রে থাকলেও তার প্রভাব নগণ্য।

খসড়া হিসেব কষে দেখি, ২৬৬ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২৪০ জনের স্বপ্নের ভাষা বাংলা। তাদের সঙ্গে কথোপকথনে বুঝি তাদের আবেগ আর কল্পনার জগতে বাংলার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। গবেষকমাত্রেই বলবেন যে এই ফলাফল প্রত্যাশিত। যেটা মনকে নাড়া দিয়েছিল তা হল এদেরর মধ্যে ১০ জন পড়ুয়ার দাবি, তাদের স্বপ্নরাজ্যে বাংলা - ইংরেজি দুই ভাষারই নিয়ত আনাগোনা। ১ জন সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখার 'সাহস' তার আছে। ৫ জন পড়ুয়ার স্বপ্নভূমিতে হিন্দি ছাড়া অন্য ভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ, যেখানে অন্য ৬ জন পড়ুয়া হিন্দির সঙ্গে বাংলাতে ভাগ করে নেয় স্বপ্নের চাবিকাঠি।

শেষের এই আপাত - নগণ্য ভাষিক চেতনার পরিসংখ্যান কৌতূহলী করে তুলেছিল তাদের আবেগের রাজ্যে এক উলটপুরাণের খোঁজ নিতে, যা স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব, ঋণাত্মক এক অনুভূতি প্রশ্ন রেখেছিলাম, তাদের ঝগড়ার ভাষা কী? তার্কিকরা খুশি হবেন জেনে ২০ জন কিশোর - কিশোরীরর তর্ক, বিবাদ এবং গালমন্দের পরিসংখ্যান - ৫ ১। ঝগড়া বাংলায় করলেও ইংরেজিতে গালি দেওয়ার সুবিধে বলে রায় দিয়েছেন ৩০ জন শিক্ষার্থী। মাত্র দুজন ছাত্রী হিন্দিতে ঝগড়ায় পারদর্শী— - হিন্দিভাষী প্রতিবেশীর কটূক্তিই যার প্রেরণা। ওপরের এইসব হিসেবনিকেশ শিক্ষার্থীদের ভাষিক প্রবণতার খণ্ডচিত্র মাত্র।

।। পরিপ্রেক্ষিত ।।

কিন্তু এই প্রবণতার ছবি একটি প্রশ্ন মনে এনে দেয় যে ভাষায় মানুষ আবেগ প্রকাশ করে আর যে ভাষাকে ঘিরে আবেগ রচিত হয়, সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে তারা কতদূর আলাদা হতে পারে? বাংলা ভাষার প্রশ্নে এই দুই মে মিলে যায়। কিন্তু ইংরেজি? বাংলা মাধ্যমে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীর কাছে ইংরেজি মূলত প্রয়োজনের ভাষা -

আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে হিসেবে তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কিন্তু এই ইংরেজিকে ঘিরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের স্বপ্নের শেষ নেই। আকাঙ্খাও অনন্ত। সেই আকাঙ্খারই প্রকাশ শহর ও আধাশহরের অলিতেগলিতে ইংরেজি কথোপকথনে দক্ষতার প্রতিশ্রুতি শোভিত ইভনিং টিউটেরিয়ালের পোস্টার, বাংলামাধ্যম স্কুলগুলির ক্রমশ ছ াত্র - শিক্ষকহীন হয়ে শুকিয়ে যাওয়া। ভাষাকেন্দ্রিক সমাজচিত্রের পট পরিবর্তনের এই ক্যানভাসকে এখন আর উপেক্ষা করা চলে না। সংবাদমাধ্যম, মিছিল জনসভ া ও জনমত প্রকাশের অন্যান্য মঞ্চেও ইংরেজি দাবি সোচ্চার, অন্যথায় উদ্‌বেগ, আশঙ্কা, হীনমন্যতা। আবেগ ছাড়া কি জনমত তৈরি হয়? পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরক ারপক্ষ নিয়োজিত পবিত্র সরকার কমিশনের পাতায় জনমতের এই তীব্রতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে

In the Course of its visit to the Primary schools and its intensive interaction with the teachers, parents, and people interested in education, the committee was much impressed by the widespread desire for English in almost all stations of life, and in all classes and categories of people. An overwhelming majority of the parents told the committee in clear and unambiguous terms that they wanted their wards to learn English and learn in early… They just want their children are given an opportunity to learn English, “the earlier, the better,” The middle class parents say this in chorus, but even those who cannot be called ‘middleclass’ in the strict economic sense of the term, but are aspirants to become member of it sooner or later, i.e. rickshaw – pullers, rickshaw van drivers and other members of the day – labouring class, demand in unison that English must be a component in the syllabus at the primary stage.

সামাজিক শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই প্রবণতা যে প্রকট, তা আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। জনমতের এই আবেগ মধ্যবিত্ত ও নি ম্নমধ্যবিত্তের জি টির ভাবনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ইংরেজিতে তাই স্বপ্ন দেখা কঠিন, কিন্তু চেতনায় একে অগ্রাহ্য করা সহজ নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে ইংলিশ ইন্ড্রা ষ্ট্রির যে বিরাট বাজার তৈরি হয়েছে,সে বাজারই এই ভাষাকে পণ্য হিসেবে বেচেছে। সে পণ্যের বৈচিত্র বড় কম নয়। ইংরেজি সাহিত্যের সম্ভার বিপুল এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে লালিত লেখকলেখিকাদের অবদানে প্রতিদিন সংযোজিত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। সংবাদ ও বিনোদনের মঞ্চে ইলেকট্রনিক পুঁজির প্রাচুর্য এই ভাষাকে পৃথিবীকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে কার্পণ্য করেনি। ভাষার ক্রেতাকে পণ্যমোহবদ্ধ করে তোলার কাজে এই ইন্ডাষ্ট্রির চেষ্টার ত্রুটি নেই। এই প্রকল্পে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছে ইংরেজির আন্তঃবলয়ের দেশগুলি মূলত ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ভারতে এই ইন্ডাষ্ট্রির ক্রেতা সংখ্যা আন্তর্জাতির নিরিখে কম নয় কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে খুব বেশি নয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ ভারতে বাজার অর্থনীতি বিনিয়োগ, বন্টন ও বিজ্ঞাপনে পাশ্চাত্যের মত সর্বব্যাপী নয়। দ্বিতীয়ত এদেশের আমজনতার নিয়মিত ক্রেতা হয়ে ওঠার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। এবং তৃতীয় কারণ, ভোগ্যপণ্য হিসেবে ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। ভাষা একই সঙ্গে সংস্কৃতির অঙ্গ এবং মানুষের সহজাত বা জৈব সামর্থ্য। অন্য ভোগ্যপণ্যের মত তাকে সহজে বা বর্জন করা যায় না। ত ার গ্রহণ এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি এবং দেহ ও মনের জটিল ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল । কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মতোই একটি ভ াষাও যে ক্রেতা - বিক্রেতার সম্পর্ক - নির্মাণে, আদানপ্রদান এবং পণ্যমোহ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে, বিশ্বের ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রি তার প্রমাণ, বদ্রিয়ার বলেন, ভাষার মতোই ভোগ্যপণ্যও একটি চিহ্ন-চিহ্নিতের বলয় গড়ে তোলে। এই মোহের বৃত্তে ব্যক্তে- মানুষ তার ব্যবহার্য পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য এবং পন্থা সম্পর্কে যতটা না সচেতন হয়ে ওঠে, ঐ পন্য সমাজের যে যে চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। ভাষাগত প্রতীকচিহ্নের মতই ভোগ্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়, বন্টন, নির্বাচন এই চিহ্ন - সম্পর্কের দ্বারা সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পণ্যের চাহিদার মাত্রা বজায় রাখার জন্য যোগানের মাত্রা সবসময়ই চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হয়ে থাকে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উল্লিখিত ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে বয়ান রচনা করেছিলাম, তার বাইরে ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রির প্রধান ক্রেতার ভূমিকায় ভারতীয় জনসংখ্যার যে অংশ রয়েছে তারা মূলত শহরবাসী,. ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত, স্বচ্ছল, মিশ্র সংস্কৃতির ধারক, তথাকথিত এলিট বা সুবিধাভোগী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অথবা শ্রেণি, ধর্ম, স্থান, শিক্ষা নির্বিশেষে ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা। অনেকক্ষেত্রে ভাব ও আবেগের প্রকাশ এই ভাষাশ্রেণি ইংরেজি মাধ্যমেই বেশি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। হয়ত এদের স্বপ্নের ভাষা ইংরেজি, ঝগড়ার ভাষাও তাই। ---তবে তা অনেকাংশেই ভাষিক পটভূমি এবং পরিবেশ সাপেক্ষ। যে কোনো ভাষাকে আবেগের ভাষায় পর্যবসিত হতে হলে সেই ভাষার দক্ষতার প্রাপ্তি অনিবার্যভাবে উঠে আসে। ভাষার শব্দভাণ্ডার সেক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে কারণ শব্দের সঙ্গে বস্তুর কাল্পনিক সম্পর্কই চিহ্ন-চিহ্নিতের বোধ নির্মাণ করে আবেগ প্রকাশিত হতে সাহায্য করে। ইংরেজি ভাষায় স্বল্পশিক্ষিত বক্তা ভাষিক চিহ্নের অপ্রতুলতার ক ারণে স্বপ্নকে ভাষার অবয়ব দিতে পারে না। অপরপক্ষে প্রয়োজনের নিরিখে স্থাপিত সম্পর্ক এই ভাষাকে বক্তার দৈনন্দিন বাচনিক ক্রিয়ার কেজো কাঠামোয় সীমাবদ্ধ রাখে।

।। ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ।।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়শীল দেশগুলিতে ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রি মিথ হিসেবে এক ধরনের জীবন-যাপনের লোভনীয় ছবি তুলে ধরে যা নাকি শুধু ইংরেজিতে পারদর্শী হলেই লভ্য হতে পারে, ইংরেজিকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্বপ্নের একটা মুল চাবিকাঠি। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত মেকলের মিনিটে ইংরেজির ছত্রছায়ায় ললিত এমনই এক লিয় াজঁ গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছিল, যারা এই প্রতিশ্রুত জীবনযাত্রার প্রতিনিধি হয়ে জনগণের অন্য অংশকে স্বপ্ন দেখাবে, লালন করবে তাদের লিপ্সা

We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern – a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ লালিত এই এলিট শ্রেণির সাংস্কৃতিক উত্তরসূরী ক্রমশ সফল - সক্ষম, সপ্রতিভ, কেতাদুরস্ত, বিত্তশালী, প্রবাসমুখী জীবনধারার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ধনী- নির্ধনের ক্রমবর্দ্ধমান শ্রেণিবৈষম্য, আর্থসামাজিক সুযোগসুবিধার ক্রমসঙ্কোচন, বেকারীত্ব, দারিদ্র্য, অপরাধপ্রবণতা, পণ্যমোহবদ্ধতা এবং জনম াধ্যমের প্রভাব আমজনতাকে ক্রমশ ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু করে তুলেছে। আকাঙ্খার মৃত্যু, হতাশা আর অসহিষ্ণুতাই জিইয়ে রেখেছে বহু ভাষাগত মিথকে। ভাষার শক্তিস াম্য নির্ধারণে ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে গৃহীত ভাষিক কেন্দ্রীকরণের নীতি ভারতে জনগোষ্ঠীর তৃণমূলস্তরে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত বহুভাষিকত ার ঐর্য ও সম্পদকে চরম উপেক্ষা করেছে। প্রতিষ্ঠানসর্বস্ব রাষ্ট্রনীতির পরিকাঠামো স্বাভাবিকভাবেই এলিট - মুখাপেক্ষী হয়ে গড়ে উঠেছে। ইংরেজিকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্বপ্নের উৎস তাই আমজনতার ঋণাত্মক অনুভূতি ; পাওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকেও না-পাওয়ার যন্ত্রণা, প্রাপ্ত অংশ সম্পর্কে উদ্‌বেগ, সংশয়, অসম্পূর্ণতাবোধের

জন্ম দেয়। এ ভাষা তাদের চাহিদার বিষয়, কামনার অঙ্গ, তবু অধরা। কারণ অনুসন্ধান করলে লকাঁ বলবেন ব্যক্তির চাহিদা, তার কামনা, কামনার বিষয় ও তার দুষ্প্রাপ্যতা, এ সবই তো পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি, 'অপরে'র নির্মাণ। যা তার কাছে সহজলভ্য, তার একান্ত নিজস্ব বলে অনুভূত, তাও সেই 'অপরে'রই সৃষ্টি।

কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের কাছে যা আংশিক বা সম্পূর্ণ অধরা, তাই 'অপর'। 'অপর'কে আত্মস্থ করার ইচ্ছাই তার অসহিষ্ণু, প্রতিবাদী বাসনা উৎস, সংগঠিত বা অসংগঠিত জনমতের উপাদান। স্বপ্নে ও বাস্তবে এই বয়ান তার 'নিজস্ব' ভাষায় নির্মিত হয়---যে ভাষায় চিহ্-- চিহ্নিতের সম্পর্কের গভীরে তার বিচরণ স্বচ্ছন্দ, যেখানে 'মেটাফর' - 'মেটেনিমি'র খেলায় সে অভ্যস্ত, সাবলীল ও নিশ্চিত। ক্ষেত্রবিশেষে রণকৌশল সাজাতে সে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় 'অপর'-এর ভাষা, বিষ দিয়ে বিষক্ষয়ের লড়াই চলে। তার বয়ানে বিষয়বস্তু নির্মাণে আত্ম-অপরের ভেদরেখা সময়ে সময়ে অস্পষ্ট হয়ে যায়, শুধু মাধ্যম নির্বাচনে তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

এই লড়াইয়ে প্রত্যেকটি মানুষ একা, কারণ এই লড়াই প্রতিযোগিতামুখী, আত্মসুখই এর লক্ষ্য। ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রির সুদৃশ্য প্যাকেজে পরিবেশিত ভাষিক পন্যের আবেদন পৃথকভাবে প্রত্যেক ক্রেতার কাছে পৌঁছে যায়। ইঁরেজি শিক্ষার স্বল্পস্বল্পপ্রসন্ধ, সংক্ষিপ্ত কোর্স, মৌখিক ইংরেজির চটজলদি পারদর্শিতা অর্জনের টিপস যে ঝকঝকে স্মার্ট, ভোগী জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়, তা একধারে যেমন বাড়িয়ে তোলে আকাঙ্খা, অপরদিকে গভীর করে তোলে পণ্য ও ক্রেতার মানসিক বিচ্ছিন্নতা (alienation), অপ্রাপ্তিযোগে যা পর্যবসিত হয় ক্রেতার মানসিক বিপন্নতায়। ভোগবাদী সাধনার হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার দিক এটি। সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অংশীদার হওয়ার নিরন্তর আকাঙ্খা এবং বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা ক্রমশ মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার ভোগবাদী সত্তা তার নিজের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এক বলয় তৈরি করে। এবং ঐ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানে তাকে নিরন্তর লড়াইকরতে হয় নিজের সঙ্গে, তথা সেই সব এজেন্সির সঙ্গে যারা লিপ্সাপূরণে বাধার সৃষ্টি করেছে।

বিশিষ্ট ভাষাবিদ আর. কে. অগ্নিহোত্রী এবং এ.এল., খান্না শতাব্দীর নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের ছটি প্রদেশের রাজধানী এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লিতে একটি সার্ভে করেছিলেন। নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কলকাতা, ইটানগর, বম্বে (বর্তমান মুম্বই), হায়দ্রাবাদ, চন্ডীগড়, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লির স্কুল, কলেজ ও ৰিবিদ্যালয়ের ১০৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে। তাদের সামগ্রিকভাবে ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরেজি সংক্রান্ত মনোভাব ও শিক্ষার আগ্রহ, পারিপার্শ্বিকে ইংরেজির ভাষিক অবস্থান এবং দৈনন্দিন জীবন ইংরেজির ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের প্রাটিও বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যেই রাখা হয়েছিল। ফলাফল বিচার করতে বসে ঐ দুই ভাষাবিদ যে প্রবণতাটি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, তা তাঁদের ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি

Though all learners of English show substantial levels of classroom anxiety, learners coming from low income group families appear to be far more anxious. তাঁদের পর্যবেক্ষণের আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন

A negative correlation was noticed between income and parental encouragement suggesting that the low income group puts greater pressure on its children to learn English. Similarly, a negative correlation was seen between occupation and the use of English as medium of instruction at the primary level i.e.> lower the socio – economic status of the family, the greater its children. This is a very clear index of socio-economic insecurity and it is out of sheer desperation and frustration that the lower income group claims higher levels of proficiency in English and recommends English as the medium of instruction from the early childhood.

ভাষাবাদ/ পুঁজিবাদ

সাধারণ নিয়ম এই যে ক্ষমতাশীল উচচবর্গীয় ভাষাই মিথ তৈরি করে। যেন তার জানা আছে আলিবাবার গুহায় প্রবেশের মন্ত্র। যে মন্ত্রে নিমেষে দূর হয়ে যেতে পারে বেকারি, দারিদ্র্য, হতাশা --- ডেকে আনতে পারে উজ্জ্বল দিন। ফিলিপসন (১৯৯২) ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ইংরেজি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের সময় অথবা স্বাধীনোত্তর যুগে তাদের পূর্ববর্তী উপনিবেশে তথা তৃতীয় বিৰে অর্থনৈতিভাবে দুর্বল দেশগুলিতে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিথের মালা গেঁথেছে যুক্তির গ্রন্থিতে। এই সব দেশের অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন 'আর্থিক সাহায্যের'' পরিচয়ের যে 'মস্তিস্কে প্রক্ষালন যন্ত্র' নিরন্তর কাজ করে চলেছে তার হাতে অস্ত্র অনেক এবং সেগুলি সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত। এই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি একটি জনগোষ্ঠীর কাছে নিরন্তর প্রমাণ করার চেষ্টা করে (persuade) যে তাদের ভাষার তুলনায় ইংরেজি অধিকতর উন্নত একটি ভাষা। কখনও প্রতিশ্রুতি (promise) দেয় আর্থিক সাহায্যের, কাঙ্খিত পণ্যের, পরিষেবার--- আধুনিক, কার্যকরী, বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাশিক্ষার--- রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সভ্যতার অগ্রগতিতে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবার প্রলোভন দেখায়। কখনও সে ভয় দেখায় (threats)---ইংরেজিকে পরিহাস বা অবজ্ঞা করলে সভ্যতার ইঁদুরদৌড়ে পিছিয়ে পড়ার ভয়, ঐ দেশের প্রবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ভয়। সে প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করে ইংরেজিই একমাত্র নিরপেক্ষ ভাষা। বহুভাষা মানেই সংঘাত, একভাষাই শ্রেয়। এ সবই আন্তর্জতিক স্তরে ভাষার ক্ষমতার রাজনীতিকে যথার্থতা দানের প্রচেষ্টা, প্রতিবাদের শাণিথ অস্ত্রকে বানানো যুক্তির ঘায়ে দুর্বল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। তথাকথিত 'তৃতীয় বিৰের' মানুষের ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'স্বপ্ন' আর 'দুঃস্বপ্নের ভেদ এভাবেই মুছে যায়। তারা পরস্পরের সম্পূরক হয়ে ওঠে।

তবু ভাষিক ক্ষমতার এই আন্তর্জাতিক বৃত্ত অবিচ্ছিন্ন নয়। এর পাকেচক্রে অন্দরে - কন্দরে অপেক্ষাকৃত ছোটো ছোটো বৃত্তে ক্ষমতায় বয়ান রচিত হয়। জন্ম নেয় অন্য অজস্র মিথ। স্বাধীনোত্তর ভাৰতবর্ষে ভাষানীতি নির্ধারিত হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে এই মিথ রচিত হয়েছে। কাগজে কলমে হিন্দি ভারতের প্রধান সরকারি ভাষা এবং ইংরেজি সরকারি ভাষা। হিন্দিকে আর স্থান অধিকার করতে তুলে ধরতে হয়েছে তার ঐর্য আর ক্যারিশমার আখ্যান। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিপুল পুঁজির বিনিয়োগের আশ্রয় নিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য। ইংরেজি সম্পর্কে নির্মিত আন্তর্জাতিক মিথ হিন্দি বিরোধীদের সহায়তায় ভারতে শক্ত জমি পেয়েছে। জাতীয় স্তরে এবং আঞ্চলিক স্তরেও এই বানিয়ে তোলা ইমেজের আখ্যান কম চমকপ্রদ নয়। এদেশে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ বিভাজনের নীতি অনুসৃত হওয়ায় প্রাদেশিক স্তরেও রাজ্যের প্রধান ভাষাকে স্বীকৃতি ও স্থায়িত্ব দিতে বিস্তৃত হয়েছে নতুন মিথের রচনা। নির্ধারিত মাপকাঠির গন্ডী পার হয়ে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি অর্জনের প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছে বিভিন্ন 'আঞ্চলিক' ভাষা। ভাষাভিত্তিক রাজ্যবিভাগের ফলে ভাষার রাজনীতিতে পরাজিত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বিভক্ত সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীসমূহ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং সুরক্ষার জন্য ভাষাআন্দোলনে সামিল হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপরেখা স্পষ্ট এবং তা দীর্ঘ আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার ফলশ্রুতি। এই প্রতিবাদী আন্দোলনগুলি তাদের ঘোষিত দাবির সপক্ষে শক্তিশালী ভাষার বিদ্ধ বয়ান তৈরি করেছে। দুই বিরোধী মিথের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতার দন্ড কখনও মেবদল করেছে, কখনও বিভক্ত হয়ে উভয়ের সংঘাতকে তীব্রতর করে তুলেছে।

ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আবেগ যখন দাবি ও চাহিদা প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক হাতিয়ার, তখন তাকে প্রয়োজনবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাষামাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ

করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে উত্থাপিত এ রাজ্যের জনগণের দাবি বাংলা মাধ্যমেই সোচ্চার। কেন্দ্র তথা আন্তর্জাতিক মঞ্চে উত্থাপিত হতে গেলে তার অবশ্যই সর্বজনবোধ্য ভিন্ন মাধ্যম প্রয়োজন কারণ এক্ষেত্রে মাধ্যমের চেয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকেই ঝোঁকটা বেশি। তাই ঝি জুড়ে ইংরেজিবিরোধী বয়ান বহুক্ষেত্রে ইংরেজিতেই রচিত হতে দেখি। এই প্রয়াসে অধিকার লাভের প্রশ্নই বড়, মাধ্যম সেখানে গৌণ।

কিন্তু যে আবেগ সংগ্রামের জন্য নয়--- নিছকই ভালো লাগা, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও নান্দনিকতার জন্যে মথিত --- যার সান্নিধ্যেলালিত হয় ভাষাবোধ, ভাষাপ্রেম, ভাষার সঙ্গে গড়ে ওঠে এমন এক সখ্যতার সম্পর্ক যা শুধুই প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যে আবেগ প্রকাশ করে কোনো বিশেষ ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্তির নিঃশঙ্ক স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, সেই আবেগকেও কি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ক্ষমতাশালী 'অপ' ভাষা? প্রশ্ন অনেক। ইংরেজির এই পেশি প্রদর্শনের যুগেও কেন ইন্টারনেটে বাংলার মাত্রা বেড়ে চলে? কেন ভারতীয়দের লেখা ইংরেজি সাহিত্য ক্রমশ বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হয়ে ইংরেজি ভাষার অন্তর্বলয়ের স্বীকৃতি ও সহযোগিতা লাভ করা সত্ত্বেও এদেশের কয়েকশো কোটি জনতার কাছে অবিদিত রয়ে যায়? ইংরেজি নিয়ে এই মাতামাতি কি তবে বাংলা বিরোধিতার নামান্তর? যে ২৬৬ জন ছাত্র - ছাত্রীর মতামত গহণ করেছিলাম তাদের মধ্যে ২২৫ জন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিল তারা খুশি যে তাদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা তাদের কাঙ্খিত নয়। ২০৪ জনের মতে বাংলা ভাষার শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষার চেয়ে গুত্বপূর্ণ। প্রবণতা বিচার করে বলা যায় যে ইংরেজি প্রেম তাদের মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। তাদের স্বপ্নের ভাষা, ঝগড়ার ভাষা, শপথের ভাষা, প্রার্থনার ভাষা, দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাওয়া ভাষা প্রাতীতভাবেই বাংলা। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়ে কি থেমে গেলে চলবে? মুদ্রার অপর পিঠটিও যে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই মতানৈক্যের পথ বেয়েই প্রোথিত হয় হতাশার বীজ, তৈরি হয় সমস্যার ইমারত, ক্রমাগত ইন্ধন পেয়ে যা একসময় প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। তাই প্রশ্নের সংখ্যা বেড়ে চলে কেন ঐ স্কুলপড়ুয়াদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ (৩০জন) আজীবন বাংলামাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থায় লালিতহয়ে তারই প্রতি পোষণ করে চলেছে ঘৃনা ও বিদ্বেষ? কেনই বা তারা বাংলা ভাষা শিক্ষার চেয়ে ইংরেজি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে চায়? কেন স্কুলস্তরে হিন্দি শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে চায়? কেন স্কুলস্তরে হিন্দি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন১৬৪ জন শিক্ষার্থী তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিভাষা শিক্ষার দাবি তোলে? --- যেখানে অপর ৬০ জন পড়ুয়া তৃতীয় ভাষাকে 'বোঝা' বলে রায় দেয়? এরকম কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এক নজরে দেখে নেওয়া প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক দশকে ভাষাশিক্ষার কর্মসূচি,তার সপক্ষে এবং বিপক্ষে রচিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতিতে ইংরেজি পক্ষ ও বিপক্ষ

যদিও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ব্যবস্থায় প্রায় ৯টি ভাষায় পঠনপাঠনের সুযোগ রয়েছে তবু সরকারি কর্মসূচি মূলত বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিকে কেন্দ্র করেই বেশি তৎপর। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও মনে করা হত যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষিত করার কাজে এই স্কুলগুলিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অথচ ১৯৯৯-২০০০ এর মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখি পশ্চিমবঙ্গে ৫২,৪২৬টি প্রাথমিক বিদ্যাপয় এবং ১১,৪৪০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অথচ এই শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে ২.৭-২.৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী যাদের অধিকাংশের বয়স ৫ থেকে ১৪ বছর। একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত স্কুল রয়েছে প্রায় ৩০০ টি। ১২ শতাংশ স্কুলের বাড়ি নেই। NCERT আয়োজিত ষষ্ঠ সারা ভারত শিক্ষা পর্যালোচনায় (১৯৯৮) প্রকাশ ঃ পর্যবেক্ষিত ৪৮৫৫৭টি নিম্ন বুনিয়াদী ও ২৮৬৩টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৮২৬৯৯ ও ৬৭১১ টি ব্ল্যাকবোর্ডের অভাবে পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে এই ধরনের সার্ভে হয়েছে কিনা তা বর্তমান লেখকের জানা নেই তবে সেই স্কুলগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি এবং অবৈতনিক নয়। তাই তার পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা - অব্যবস্থাই বহুক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি মাধ্যমের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে দিচ্ছে, যাকে আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণত ভাষাকেন্দ্রিক অগ্রাধিকার বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, শহুরে জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ, যাদের আর্থিক সঙ্গতি হয়েছে তাঁরা ইংরেজি মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা সত্যি যে গ্রামে এই প্রবণতা প্রায় চোখেই পড়ে না। তার অন্যতম প্রধান কারণ সুযোগের অভাব। তাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ক্রমশ শহরমুখী হয়ে পড়ছে। ২০০২ সালের ইণ্ডিয়ান রীডারশিপ সার্ভে নগরায়নের এই উল্লেখযোগ্য চিত্র তুলে ধরেছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে কলকাতার জনসংখ্যা বেড়েছে ১৮ শতাংশ। গত ১০ বছরে ভারতে গড়ে ওঠা নতুন শহরের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ চারটি মাত্র প্রদেশে বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং এদের সর্বাধিক সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে, ১১৩টি। নগরায়নের এই ধারার সঙ্গে এলিট ভাষার চাহিদা বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধুমাত্র শহর সৃষ্টি নয়, শহরের ভাষা তথা সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলও. এর অন্যতম কারণ। গত কয়েক শতক কলকাতার অবাঙালির সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়েছে। অন্য ভাষাভাষী পড়ুয়াদের কাছে ইংরেজি মাধ্যম বা বাংলা মাধ্যমে ইংরেজির অগ্রাধিকার সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভাষা সংক্রান্ত বিবাদ - বিতর্ক মূলত দুটি বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে; প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষার যথার্থতা এবং ইংরেজি শিক্ষণের উপযুক্ত পদ্ধতি। প্রথম বিষয়টিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং আমজনতার ভূমিকা, মতামত আদানপ্রদান এবং মতানৈক্য বিষয়টিকে শুধুমাত্র শিক্ষার পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দাবি নিয়ে জনসাধারণের যে অংশ এগিয়ে এসেছে তারা অর্থমূল্যের বিনিময়ে ইংলিশ ইণ্ডাষ্ট্রির ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা নয়। প্রাথমিক শিক্ষার অবৈতনিক ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার দাবি উত্থাপন করে তারা মূলত তাদের মৌলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় শুধু মাত্র দাবি বা চাহিদা নয়, ইংরেজির সোপানে পা রাখার এই মরিয়া ভাব তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাহীনতার দলিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, চাকরিক্ষেত্রে সুযোগের ক্রমসংকোচন এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সমস্ত আর্থ সামাজিক নিয়মনীতি ও কার্যকলাপের প্রতি অসহায় রাগ পরিবাহিত হয়েছে ইংরেজিকেন্দ্রিক আন্দোলনে। ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সামগ্রিক শিক্ষার সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজির অনুশীলনই একমাত্র কাম্য। এই আবেগের অন্তরালে চাপা পড়ে যায় শিক্ষা ও বেকারীত্ব সংক্রান্ত সমস্যার মূল সূত্রগুলো। তাই সরকার পক্ষ যখনই বিদেশি ভাষা শিক্ষার এই ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করতে চেয়েছে তখনই উঠেছে প্রতিবাদের ঢেউ। প্রতিকারের অভাবে অভিমানী, আতঙ্কিত শিক্ষার্থী প্রবাসী হতেও দ্বিধা করেনি।

কেন্দ্রে ১৯৬৫ - ৬৬ সালে স্থাপিত কোঠারি কমিশন ত্রিভাষা-নীতি প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজির পঠনপাঠনের বিষয়টিকে ছেড়ে দিয়েছিল রাজ্যের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে এস.এন.লাহা সাব-কমিটির সুপারিশে ১৯৫০ সালে প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস ঘোষণা এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হিমাংশু বিমল কমিটির দ্বারা তার পরিমার্জনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছিল। কংগ্রেসের হাত থেকে সরকার গঠনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল বামপন্থী শাসক দলের হাতে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত পঞ্চম শ্রেণি থেকে ইংরেজি শু করার প্রস্তাব ষষ্ঠশ্রেণি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয় নতুন প্রস্তাবে।

এর বিদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা এবং দলের প্রচার উদ্যোগে। ১৯৭৭ সালে এস.ইউ.সি.আই., ছাত্র রাজনীতির অন্যতম প্রতিনিধি ডি.এস.ও. এবং প্রাথমিক শিক্ষক সংস্থা বি.পি.টি.এ কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে ১৭-১৮ ই জুলাই এক বিরাট সমাবেশে জমায়েত সংগঠিত করে। তাদের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঠিত হয় অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ স্ট্রাগল্ কমিটি। তাদের দাবি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রীকে তারা এই আন্দোলনে সামিল করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর চলে মিটিং মিছিল, সমাবেশ। মজুমদার কমিটির সুপারিশ কাজে পরিণত করার দিন ধার্য হয় ১৯৮১ সালে শিক্ষাবর্ষের শু থেকে,এর বিদ্ধে এসপ্ল্যানেডে (পূর্ব) ধরনা দেয় বহু মানুষ (৮ই জানুয়ারি, ১৯৮১)। স্মারকপত্রে যাঁরা সাক্ষর করনে তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড.সুকুমার সেন, ড. নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, ড. প্রতুল গুপ্ত, গৌরী আইয়ুব, শৈলেন দে, অমিতাভচৌধুরী প্রমুখ।

১৯৮৪ সালে নিযুক্ত উচ্চশিক্ষার মূল্যায়নে ভবতোষ দত্ত কমিটি ইংরেজিকে তৃতীয় শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শু করার প্রস্তাব রাখে। এই বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সংসদ আরও কিছু ভারতীয় সংস্থা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে পাঠ্যসূচি এবং পঠনপাঠন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৯১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল ইংরেজিকেন্দ্রিক বিতর্ককে উসকে দেয়। কলকাতা এবং জেলাস্তরে এর বিদ্ধে হিংস্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৯৩ সালে স্থাপিত অশোক মিত্র কমিশন ইংরিজি শিক্ষা শু বয়স পঞ্চম শ্রেণিতে নামিয়ে আনে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর ১৯৯৬ সালে এস.ইউ.সি.তাই তাদের প্রাথমিক ইংরেজির দাবিতে সই সংগ্রহ করতে শু করে। তাদের দাবি অনুয়ায়ী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১০ মিলিয়ন ১২ লাখ সইসমৃদ্ধ একটি স্মারকলিপি তারা ১৭ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেয়। এর প্রভাবে রাজ্যজুড়ে যে বিপুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিহয় তার প্রভাবে অনুষ্ঠিত বন্‌ধে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। আন্দোলনের তীব্রতা সরকার পক্ষকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পথে এগিয়ে দেয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে গঠিত ইংরেজি বিষয়ক কমিটি প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই কমিটির রিপোর্টে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছিল যে জনমতের চাপই সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ। ইদানীংকালেপশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনরায় প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু সরকারের মধ্যেই এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে মতবিরোধ এবং বিতর্ক।

প্রা উত্তর প্রা

পরিশেষে একটি প্রা থেকে যায়। পঠনপাঠনের সামগ্রিক উন্নতি ব্যতিরেকে এবং ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রাটি উহ্য থেকে গেলে এই ভাষাগত সমস্যার সমাধান কি সম্ভব? অশোক মিত্র কমিশন স্বীকার করেছিলেন (১৯৯২ ১০০)—

There is a fair measure of agreement within the commission that the new method of teaching English, based on the so-called functional communicative approach, has been far from an unqualified success.

অগ্নিহোত্রী লক্ষ্য করেছিলেন সমস্ত শহরের মধ্যে কলকাতার শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে শ্রেণিগত আতঙ্ক (classroom anxiety) সবচেয়ে বেশি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শুধু ভাষাশিক্ষার উপযুক্ত বয়স বা পদ্ধতির দিকে নজর দিলেই চলবে না। তলিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে, শিক্ষার্থীর অবস্থান এবং দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন আছে ভারতের সব শিক্ষার্থীর জন্য সর্বত্র সর্বসম ভাষানীতি আদৌ কার্যকরী হতে পারে কিনা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com